পথ হারানোর পথ

- সেজান মাহমুদ

ক : অর্ধেক ভর্তি অর্ধেক খালি

তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে লেখার আগে তার লেখা বা তার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অবস্থান কি ছিল কিংবা কিভাবে সেই অবস্থানের বিবর্তন হলো তা বলে নেয়া ভালো। তার সঙ্গে আমার পরিচয় *জাতীয় কবিতা পরিষদ*-এর অনুষ্ঠানে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। সেই সময় কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্ত্রী হিসেবে এবং স্বল্প কবিখ্যাতি নিয়ে তার বিচরণ ছিল। এই সময়ে *বাংলাদেশ সঙ্গীত পরিষদ* নামে রেডিও এবং টেলিভিশনের সঙ্গীত শিল্পীদের একটি সংগঠনে রুদ্র ও আমি সংগঠক সদস্য হিসেবে যুক্ত এবং স্বৈরাচার বিরোধী অবস্থানের জন্য বেশ সক্রিয় ছিলাম।

আশির দশকের শেষের দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালের গাইনি বিভাগে মেডিকাল অফিসার (এনেসথেসিয়োলজি) হিসেবে তসলিমা নাসরিন জয়েন করলেন। আমি তখন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র এবং ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক। একজন সিনিয়র ডাক্তার, কবি এবং রুদ্রের স্ত্রী বা সাবেক স্ত্রী (আমি কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনো প্রয়োজনের বেশি মাথা ঘামানো পছন্দ করিনি) হিসেবে তাকে বেশ সমীহই করতাম। তাছাড়া বাংলাদেশের মতো সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেউ নারী অধিকার নিয়ে কথা বলছেন, একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে (অন্তত নিজে দাবি করি) তার প্রতি নৈতিক সমর্থন দেখাবো এটাই স্বাভাবিক।

মিটফোর্ডের ইতিহাসে গত দশ বছরে কোনো বার্ষিকী প্রকাশিত হয়নি। তাই নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে প্রথমেই বার্ষিকী প্রকাশের কাজ হাতে নিলাম। এবং এটাকে মামুলি কলেজ বার্ষিকী না করে জাতীয় পর্যায়ের মানসম্পন্ন করার একটা প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলাম। কিছুটা সফলতাও এসেছিল বলতে পারি। কারণ এই বার্ষিকীতে মিটফোর্ডের ইতিহাসের ওপর ড. মুনতাসীর মামুনের লেখা দুটো মানসম্পন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যা ঢাকার ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন অংশ। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন স্বনামখ্যাত শিল্পী অশোক কর্মকার। এই বার্ষিকীর কাজেই তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে কয়েক দফা কথা হয়েছে তার চামেলিবাগের বাসায় অথবা হাসপাতালের ডক্টরস রুমে। এবং তা বার্ষিকীর বিষয় থেকে সাহিত্য বা সমকালীন দর্শন ইত্যাদিতে গড়িয়েছে।

তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বোধ করি তেমন একটা মনোযোগী ছিলেন না। এ কারণে কাজের জায়গায় খুব ভালো সাপোর্টও পাচ্ছিলেন না বলে আক্ষেপ করতেন। বার্ষিকীর জন্য লেখা দিতে বললাম একটি বিশেষ বিষয়ে। তার লেখাটির শিরোনাম ছিল *বিদ্যাসাগর ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা।* এটি তার প্রথম দিকের নারীবাদী লেখাগুলোর একটি। এ লেখায় তিনি হিন্দু শাস্ত্র থেকে শুরু করে ধর্মীয় পুরোহিত বা মোল্লারা কিভাবে ধর্মকে নারীর অবদমনে ব্যবহার করেছেন তার ওপর আলোকপাত করেছেন। এই লেখাটি প্রকাশ করার জন্যে আমাকে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে শামিম সিকদারের একটি মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য মিটফোর্ডের কলেজ চত্বরে প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি বেদিটিকে রাতের অন্ধকারে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল তারা। এমনকি তা ভুয়া হলেও হত্যার হুমকি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। অবশ্য আমি সেসব কারণে দেশ ছাড়িনি।

এরপর তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হলো ১৯৯২ সালের দুই বাংলার কবিতা সম্মেলনে যোগদানের সময়। সেদিন বাংলাদেশের অনেক কবি, আবৃত্তিকারদের সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের কলকাতা যাবার কথা ছিল। কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্টে তার পাসপোর্ট আটক করা হয়। তিনি যেতে পারেননি কলকাতায়। এরপর তার *লজ্জা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হলো এবং তিনি একটি কপিও দিয়েছিলেন।

এটা পড়ে আমার মন্তব্য ছিল, *লজ্জা পড়ে লজ্জা পেলাম।* যদিও বাংলাদেশের অনেক গ্রামেই সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার আমি দেখেছি এবং এই বিষয়টি নিয়ে বড় মাপের কোনো লেখা হোক মনে মনে চাইতাম। তবে লজ্জা উপন্যাসকে বিষয় এবং ব্যাপ্তির বিচারে, উপন্যাসের কাঠামো বা আঙ্গিকের বিচারে আমার মতে মান সম্পন্ন মনে হয়নি। আমার এ অভিমত তার সামনেও প্রকাশ করেছি। ঠিক এই সময়ে তার বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের আন্দোলন শুরু হলে আরো অনেকের সঙ্গে আমিও প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। এবং একজন লেখকের স্বাধীনতার পক্ষে সংহতি প্রকাশ করেছিলাম। তখন তিনি শান্তিনগর মোড়ে তার নতুন কেনা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন।

এরপর ১৯৯৪ সালে জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইমেলাতে আরেকবার সুযোগ এসেছিল তার সঙ্গে দেখা হওয়ার। তিনি তখন সুইডেন প্রবাসী। বইমেলাতে গিয়েই শুনলাম বিরাট গুঞ্জন। তসলিমা নাসরিনের প্রেস কনফারেন্স হবে। মেলাতে বড় বড় পোস্টার, তাতে নাদিন গর্ডিমার, সালমান রুশদি, নেলসন মেনডেলা এবং ইয়াসির আরাফাতের পাশে তসলিমা নাসরিনের ছবি! এই প্রেস কনফারেন্সে তিনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি। তার কারণ, নিরাপত্তার অজুহাতে ফ্রান্স সরকার তাকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভিসা দিয়েছিল এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু যিনি এলেন তিনিই সুইডিশ *পেন* (PEN) ক্লাবের সভাপতি যিনি তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয়, সমর্থন দিয়ে ইওরোপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার নাম গ্যাবি গ্লেনসম্যান। সেই প্রেস কনফারেন্সে গ্যাবি গ্লেনসম্যানকে আমার প্রশ্নগুলো ছিল এ রকম :

এক. বাংলাদেশে আরো এ রকম প্রগতিশীল, বিতর্ক সৃষ্টিকারী লেখক ছিলেন যেমন দাউদ হায়দার, আহমদ শরীফ। তাদের বেলায় না হয়ে তসলিমা নাসরিনের প্রতি পশ্চিমা মিডিয়ার এতো মনোযোগ কেন?

দুই. তসলিমা নাসরিন ছাড়া বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?

তিন. বাংলাদেশকে মৌলবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা একটি খণ্ডিত ধারণা। কারণ এখানে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া হয়। আবার দুই ভাইয়ের মতো একই বাড়িতে পাশাপাশি বাস করে। অথচ বসনিয়া-হারজেগোভিনায় হাজার হাজার বছর ধরে পুতে রেখেছে জাতিগত বিদ্বেষ। ইওরোপিয়ান সভ্য জগতের মতো আমরা তো জাতিগত দাঙ্গায় সারাক্ষণ যুক্ত নই, মন্তব্য কি?

চার. সুইডেনের টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তসলিমা নাকি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কিছু ভালো কবিতা লিখেছেন, কথাটি সত্যি কি না?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আরেকটি লেখা লিখতে হবে ধরে নিয়ে আজকের মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

আমি লেখকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে যেখানেই স্বাধীনতার প্রসঙ্গ সেখানেই দায়িত্বের দায় ভাগ এসে যায়। সাহিত্যের ইতিহাসে ঠিক-বেঠিক, শ্লীল-অশ্লীল, রুচি-রুচিহীনতা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। একজন লেখকের লেখা বিচারে তার ব্যক্তিগত জীবন আসবে অনেক পরে। এমনকি তা নাও আসতে পারে। কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন লেখেন *বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে* তখন আমার জানার প্রয়োজন নেই তিনি কতোজনের সঙ্গে শয্যায় গিয়েছেন। তার চেয়ে আগে বিচার করা প্রয়োজন এটি কবিতা হিসেবে কতোটা উত্তীর্ণ। এটি জীবন বোধের কোন স্তরে, নান্দনিক প্রকাশে কতোটা সক্ষম এবং এটা কবিতার একটি সফল বাক প্রতিমা কি না? তেমনি উপন্যাস বা অন্য শিল্প মাধ্যমের বেলায় দেখতে হবে শিল্প মাধ্যমের নন্দন তত্ত্বের বিচারে। প্রতিটি শিল্প বিচারেরই আলাদা গ্রামার বা ব্যাকরণ আছে। তেমনি একটি নারীবাদী লেখারও বিচার হওয়া প্রয়োজন নারীবাদের প্রচলিত অনুসঙ্গে।

তসলিমা নাসরিনের লেখা *ক* পড়েছি। পড়েছি *ক* এবং *দ্বিখণ্ডিত*-এর সেন্সরবিহীন ভার্শন। পাঠকের কৌতূহল মেটাতে জানাচ্ছি যে, সেন্সরবিহীন ভার্শনটি লেখকের (দয়া করে লিঙ্গান্তর করবেন না) পাঠানো মূল পাণ্ডুলিপির কপি যা আমাকে পাঠানো হয়েছিল। লেখাটি যখন শুরু করেছিলাম তখন ইচ্ছা ছিল *ক*-এর একটি নিরপেক্ষ, নির্মোহ সাহিত্য সমালোচনা করবো, বিশেষ করে প্রচলিত নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ক নিয়ে যে তোলপাড়, মামলা, লেখা, পাল্টা লেখা হলো তাতে সে ইচ্ছার গুড়ে বালি। আমাদের পত্রিকাগুলোর বর্ণনা পড়ে যারা ক কিনেছেন তারা নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছেন। কারণ ৪১৫ পৃষ্ঠার বইটিতে সর্বোচ্চ সর্বমোট ১৫ পৃষ্ঠায় তাদের ভাষার সেই *রগরগে বর্ণনা* আছে। বাকি ৪০০ পৃষ্ঠা বা তার কিছু কম পাতায় একজন লেখকের স্পর্শকাতর মন, প্রেম-অপ্রেমের যন্ত্রণা, শঠতা, পরাজয়, প্রবঞ্চনা, ঘৃণা, মানবিকতা, প্রবৃত্তি, ক্রোধ ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে তসলিমা নাসরিন যা লিখছেন বা করছেন তা আমাদের প্রচলিত সাধারণ ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি সব কিছুর একেবারে বিপরীতে। আমরা পুরুষ কবির কবিতায় নারীর রূপ মাধুর্যের বর্ণনা পড়তে অভ্যস্ত। সেই বর্ণনা *মুক্তা শুভ্র দর্শনরাজি অপাঙ্গবিস্তৃত আঁখিকমল, স্বর্ণলতা সূক্ষ্ম ক্ষীণ, কটি, গুরুভার সুগৌল নিতম্ব গৌরব* থেকে শুরু করে *তোমার স্তন যেন মখমলে ঢাকা পর্বতচূড়া, নাভি যেন মরুর প্রান্ত থেকে নেমে এসে ক্লান্ত হয়ে থেমে আছে হ্রদ* পর্যন্ত গড়ালেও আমরা তাকে কবির শিল্পিত প্রকাশ ভঙ্গিই মনে করি। সেখানে একজন নারীর কাছে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা কিংবা যৌনতার খোলামেলা আলোচনা বেশির ভাগ মানুষের কাছেই কানে বাজবে, মানে বাজবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই টাবু (Taboo) ভাঙার সাহস এবং এ সত্যটুকু স্বীকার করার পরও কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তার এ লেখার সাহিত্য মূল্য বা ঐতিহাসিক মূল্য কতোটুকু?

সমসাময়িক রাজনৈতিক দর্শন (Contemporary political philosophy)গুলোর মধ্যে ফেমিনিজম বা নারীবাদ সবচেয়ে ডাইভার্স বা বহুমুখীন ধারা। লিবারাল ফেমিনিজম, সোশালিস্ট ফেমিনিজম, ইগালিটেরিয়ান ফেমিনিজম, এমনকি লিবারটেরিয়ান ফেমিনিজম নামের ধারাও চালু হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে এই ধারাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে তিনি না বুঝেই বা অসচেতনভাবে যে ধরনের লেখা লিখেছেন তাকে বলা হয় নিও ফেমিনিজম (Neo Feminism) বা নব্য নারীবাদ।

না বুঝেই কেন বলছি? তার কারণ, আমি যখন তাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি *ক* বইতে যেমন লিখেছেন, *'আমার বিশ্লেষণ ক্ষমতাও বিশেষ ভালো নয়, আর্থসামাজিক শব্দটির মানে বুঝতেই আমার অনেক দিন লেগেছে তেমনি বলেছেন, আমি নারীবাদের কোনো তত্ত্বই বুঝি না।'*

তার এ বক্তব্যকে বিনয় ধরে নিয়েই বলতে পারি, তার এ লেখাটি নিও ফেমিনিজম-এর অনুসারীদের মতো। এক কথায় এ মতবাদের অনুসারীরা মনে করেন যে, নারীর সমান অধিকারই যথেষ্ট নয়। এতোকাল ধরে পুরুষেরা যে অন্যায়, অবিচার করে এসেছে এখন তার *পে ব্যাক* বা দাম পরিশোধের সময়, কোনো কোনো চরমপন্থীদের মতে প্রতিশোধের সময়। কেউ কেউ এই লেখাকে পুরুষ বিদ্বেষ বা Misandry হিসেবেও বিবেচনা করতে পারেন।

এ সম্পর্কে তসলিমা নাসরিন নিজে কি বলেন? তার মতে, তিনি কোনোভাবেই পুরুষ বিদ্বেষ বা প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে কিছু লেখেননি। বিবিসি-র সঙ্গে দেয়া তার সাক্ষাৎকারটিতেও একই কথা বলেছেন তিনি। এখানে বলে নিচ্ছি যে, যেহেতু *ক*-এর আংশিক হলেও পোস্ট মর্টেম করার প্রয়োজন আছে, আমি লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছি এবং দীর্ঘ দুই ঘণ্টার টেলিফোন আলোচনায় আমার যেখানে যা প্রশ্ন তার উত্তর জেনে নেয়ার বা তার দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নেয়ার চেষ্টা করেছি। তসলিমার এই লেখাটিকে এবং অন্য লেখাগুলোকে কেউ কেউ সাহিত্য পদবাচ্য নয় বা

লেখকের স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহার কিংবা মানুষের সম্পর্কের মৌলিক বিশ্বাসের বরখেলাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রশ্ন করেছেন তার এথিক্স নিয়ে। আমিও তাকে প্রশ্ন করেছি অনেক বিষয়ে। যেমন –

একজন নারীবাদী লেখক হয়ে কি করে লিখতে পারলেন, মিলন *যেনতেন* এক গোবেচারা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে শুরু করেছে। কিংবা ফরিদা আখতার নামে এক হাড়গিলে মহিলা। এটা কি আরেকজন নারীকে অপমান করা নয়? তার বক্তব্য এই যে, তিনি *যেনতেন* বলতে সাধারণ বোঝাতে চেয়েছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমি বলবো, যিনি লেখক তার কাজ শব্দ নিয়ে খেলা করা। সেই শব্দ ব্যবহারে যদি একটি শব্দ ফসকে আরেকটি বেফাস শব্দ বেরিয়ে যায় তাহলে বলতেই হবে, কাঠমিস্ত্রির হাতুড়ি–বাটালে ধার দেয়ার প্রয়োজন আছে।

তাকে আরো প্রশ্ন করেছিলাম যে, দুটি মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক মানসিক আদান–প্রদান ঘটে। হুট করে, একপাক্ষিকভাবে কোনো কিছুই হয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। অথচ ক বইতে মাঝে মধ্যেই মনে হয়েছে বর্ণনাগুলো একপেশে। অর্থাৎ যখন সম্পর্ক ভালো ছিল তখন যাদেরকে একভাবে বিচার করেছেন আবার কোনো কারণে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে বা অন্য যে কোনো কারণে তাদেরকে বিচার করা বা উপস্থাপন করার ভঙ্গিটি পাল্টে গেছে, কেন? এ কথার তেমন একটা সদুত্তর তিনি দেননি।

অন্যদিকে আমাদের দুই বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, লেখকদের কেউ কেউ তসলিমার রুচিহীনতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে নিজেরা যে কি কুরুচি, পশ্চাৎপদতার পরিচয় দিলেন তা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারা যায় না। যখন দৈনিক সংগ্রাম বা ইনকিলাবে কোনো প্রতিবেদক মূর্খের মতো অশ্লীল মন্তব্য করেন তখন তাতে একটুও অবাক হই না। কারণ আমি জানি যে, এই প্রতিবেদনের পেছনে আছে মধ্যযুগীয়, ধর্মান্ধ, কূপমণ্ডুক কোনো মস্তিষ্ক। কিন্তু যখন প্রগতিবাদী, মুক্ত মনের দাবিদার কোনো লেখক অন্য লেখকের সমালোচনা করতে গিয়ে নিজেদের সত্যিকারের পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে ফেলেন তখন বলতে বাধ্য হই, হায়রে প্রগতি, হায়রে মুক্ত মন!

এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ মাজুমদারের কথাই ধরা যাক। তিনি বলেছেন, *প্রায় ৯০ বছর আগে কলকাতার সোনাগাছিতে একজন খ্যাতনামা বেশ্যা থাকতেন। তার নাম ছিল নন্দরানী। কলকাতার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল তার কাছে। তিনি যদি এদের নিয়ে উপন্যাস রচনার কথা ভাবতেন তাহলে তা অনেক দিন আগেই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তি জীবনে সমাজে চুপচাপ থাকার ভদ্রতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, তসলিমা নাসরিন, নন্দরানীর সেই আত্মসম্মান বোধের অংশীদার হতে পারেননি।*

অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি বললেন, তসলিমা নাসরিন একজন বেশ্যার চেয়েও অধম। এই কথার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন ওপার বাংলার সুবোধ সরকার, এপার বাংলার হুমায়ুন আজাদ এবং তসলিমাকে *বাইজি, পতিতা* কোনো বিশেষণ পাওয়া থেকেই রেহাই দেননি। এরা সবাই বিদগ্ধ পণ্ডিত, লেখক এবং ভাষা বিজ্ঞানী। এদের শব্দ ব্যবহার নিয়ে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। এরা জানেন শব্দের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রায়োগিক দিক। তাদের ব্যবহৃত শব্দ থেকেই নগ্নভাবে বের হয়ে এলো নারী জাতির প্রতি তাদের মনোভাব, বিশেষ করে যৌনকর্মীদের প্রতি তাদের মনোভাব। অর্থাৎ সোনাগাছির সেই বেশ্যার কাছে নামি–দামি লোকেরা যাবে খদ্দের হিসেবে। কিন্তু তা নিয়ে লেখা বা বলাটা হলো অশোভন। অথচ বাংলাদেশ বা ইনডিয়ার মতো দেশে চরম দারিদ্র্যের মাঝে যে মেয়েটি যৌনকর্মকে বেছে নিয়েছে জীবিকা হিসেবে তাদের শস্তা সাজ পোশাকের আড়ালে যে যন্ত্রণাময় ইতিহাস, বাইজির ঘুঙুরের শব্দের আড়ালে যে কান্নার ধ্বনি তা না দেখে যাদের মনে কামনার উদ্রেক হয় তারা যে কতোটা অশোভন, অশ্লীল এবং আত্মসম্মানহীন সেটা উপলব্ধির বোধও মনে হয় হারিয়েছেন এরা। তাছাড়া সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে প্রস্টিটিউট বা বেশ্যা অথবা পতিতা জাতীয় জাজমেন্টাল

(Judgemental) শব্দগুলোকে বর্জনের আন্দোলন চলছে সেখানে এই প্রগতিবাদীরা এখনো পড়ে আছেন পশ্চাৎপদতার অন্ধ গলিতে। সেই শব্দগুলোকে একজন লেখকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেও এতোটুকু কুণ্ঠা নেই। ধিক আপনাদের প্রগতিশীলতার! ধিক আপনাদের আত্মসম্মানবোধের!!

বেশ অনেক বছর আগে আমি একটি গল্প লিখেছিলাম যেখানে একজন গৃহস্বামী তার বাড়ির কাজের মেয়েটির নোংরা ব্লাউজের ভেতরে হাত দিয়ে তার যৌন লালসা চরিতার্থ করে তারপর সেই কাজের মেয়েটিকেই বলতো, *যা সাবানডা লইয়া আয়, হাত ধুইতে অইবো।* এই গৃহ স্বামীর সঙ্গে এদের মানসিকতার পার্থক্য খুজি কি করে?

ক-তে বর্ণিত অনেক ঘটনা পড়েই যেটা মনে হয়েছে তা হলো, তার লেখার, এমনকি পঞ্চাশ ভাগও যদি সত্যি হয়ে থাকে তা থেকে বলা যায়, তিনি অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছিলেন যৌন নিপীড়ন বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট-এর শিকার। এ ধরনের ঘটনা বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দুপক্ষের পাওয়ার রিলেশনশিপ বা ক্ষমতার সম্পর্ক। সেই সময়ে তসলিমা নাসরিন ছিলেন মফস্বল শহর থেকে আসা (আমি এটাকে নেতিবাচক অর্থে বলছি না), কবি, যশ প্রত্যাশী, সুন্দরী, ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী, কিছুটা সংস্কারমুক্ত এবং নামি-দামিদের প্রতি কিছুটা মোহগ্রস্ত নারী। অন্যদিকে কথিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকেই রাজধানীর শিল্প-সাহিত্য জগতের ক্ষমতাধারী সম্রাটের মতো। তাদের কেউ কেউ নিজেদের প্রগতিশীল মনে করলেও ক্ষমতার অ্যাডভানটেজ যে নেননি বা নিতে চেষ্টা করেননি তা তো নয়! অন্যদিকে অনেক ঘটনা পড়লেই মনে হয়, এখানে তো আর শক্তির ভারসাম্যের ব্যাপার নেই, তাহলে তিনি (তসলিমা) কেন কাজটি করলেন? যেমন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাইম কর্তৃক গর্ভপাত ঘটানো কিংবা মিলনের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপ্তি। আমি জানি, তিনি এর দায়ভাগ স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, তারও অনেক ভুল ছিল। তিনি নিজেকে দেবী বানাতে চাননি। কিন্তু এ কথাগুলো স্বীকার করলেই সবটুকু দায়ভাগ এড়ানো যায় না।

সৈয়দ হক সম্পর্কে *ক*-এর পচাত্তর পাতায় তসলিমা লিখেছেন :

এই দেবতার মতো মানুষটিকে তারপরও সব সময় দেবতার মতো মনে হয়নি আমার। কিন্তু সে কেবল মনে না হওয়ার ব্যাপার, তার কোনো অশ্লীলতা, ভালো যে, আমার কখনো দেখতে হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এ আমার অহেতুক সংশয়, এ আমার অমূলক ভয়, জগৎ না দেখা জীবন না চেনা ভীরু কিশোরীর মতো যেখানেই পা দিই, ভাবি বুঝি ফাদ পাতা, এ তাকে বোঝার ভুল। আসলে সৈয়দ হক যেমন উদার তেমন উদারই, যেমন বড় তিনি, তেমন বড়ই।

অর্থাৎ এ কথা সত্যি যে, একজন বড় মাপের মানুষের সব কার্যকারণের পরিপূর্ণ মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা কারো নাও থাকতে পারে অথবা কারো মনোবৈকল্যের জন্যে একেকটি কাজের বা প্রতিক্রিয়ার ভুল ব্যাখা কিংবা ভুল অর্থও করতে পারে। সেক্ষেত্রে এই দ্বিধাজড়িত মনোবিশ্লেষণ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার যৌক্তিকতা কোথায়?

পাশাপাশি এটাও বলবো যে, তসলিমা যদি বালখিল্যতার পরিচয় দিয়েই থাকেন, সৈয়দ হক প্রথমেই যেভাবে তসলিমার *খেলারাম খেলে যা*-র ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটাই বোধ হয় ভালো ছিল। তিনি মানহানির মামলা অবশ্যই করতে পারেন। এ অধিকার সবারই আছে। কিন্তু মামলার আর্জিতে সকলের সহানুভূতি অর্জনের জন্য তিনি এমন কোনো প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় নেই যার অবতারণা করলেন না। সেখানে মহানবীর কথা বলে ধর্মভীরুদের সহানুভূতি, দুই নেত্রীর কথা বলে রাজনীতির দুই মেরুর সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করলেন। আমি কোনো ভাবেই বলছি না যে, শুধু ধর্ম বা নবীর বিরুদ্ধে কিংবা দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে কথা বললেই প্রগতিশীল হওয়া যায়। আমার বক্তব্য হলো, সৈয়দ হক তার বিরুদ্ধে তসলিমার মিথ্যা অভিযোগ বা বানোয়াট গল্প এবং অশৈল্পিক উপস্থাপনার অভিযোগ এনেই ক্ষান্ত দিতে পারতেন। এর সঙ্গে নবী এবং দুই নেত্রীর বিষয় যুক্ত করাতে তার (সৈয়দ

হক) ও ইনকিলাবীয় অথবা সংগ্রামীয়দের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুজে পেতে কষ্ট হয়। অন্যদিকে সাহিত্যের মানে বইটির যদি কোনো দাম না থাকে তাহলে সেটা এমনিতেই সময়ের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হতো, বইটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানোর প্রয়োজন ছিল না।

আবার *ক* প্রসঙ্গে ফিরে আসি। *ক* প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অনেক লেখক, বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য মন্তব্য হলো, লেখাটি রগরগে, রুচিহীন, গ্রাম্যতায় ভরা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেউ যখন আত্মজীবনী লেখেন তখন তিনি তার নিজের ঘটনা, চারপাশ, পৃথিবীকে কি চোখে দেখছেন তা প্রকাশ পেয়ে যায়। এই দেখার চোখও আবার নির্ভর করে যিনি দেখছেন তার মেধা, মনন, অভিজ্ঞতা, মানসিক উত্তরণ, শিল্প বোধ, জীবন বোধ ইত্যাদির ওপর। সাহিত্য বা শিল্প মাধ্যমে রুচি-কুরুচি বা শ্লীল ও অশ্লীল-এর পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম, অথচ অনিবার্য। এ নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বিতর্কও হয়েছে প্রচুর। আমরা যখন বতিচেল্লি (Sandro Botticelli)-র আকা *ভেনাস* ছবিটি দেখি বা রবার্ট রিড-এর আকা *দি ওপাল* ছবিটি দেখি তখন তুলির আচড়ে আকা একজন নগ্ন নারী হয়ে ওঠেন শিল্পের সুষমামণ্ডিত। অন্যদিকে এই একই নারী পামেলা এন্ডারসন যখন প্লেবয়-তে নগ্ন ছবি ছাপেন তখন তা হয়তো বা অশ্লীল। তাহলে একই নগ্ন নারী কখনো শ্লীল কখনো অশ্লীল। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝাতে একজন বলেছিলেন, নগ্নতা সত্ত্বেও *ভেনাস* একটি শিল্প। কিন্তু যদি ভেনাসের পায়ে একটা হাই হিল পরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা হয়ে যাবে অশ্লীল। ক পড়তে পড়তে মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে, এই সূক্ষ্ম পরিমিতি বোধের অভাব রয়েছে।

তারপরও আমি বলবো, *ক* নিয়ে লেখা মাসুদা ভাট্টির *ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনাঘন আত্মজৈবনিক কামশাস্ত্র* একটি পক্ষপাতদুষ্ট শিরোনাম। এখানেও তিনি লেখার বিষয় ছাড়িয়ে তসলিমার ব্যক্তিগত বিষয়, তার যৌবন কতোদিন থাকবে বা না থাকলে কি করবেন ইত্যাদির অবতারণা করেছেন। যা শোভন কি না তা তিনিই বলতে পারবেন। তসলিমাকে যে দোষে অভিযুক্ত করেছেন তিনিও সেই দোষে দোষী। তাহলে কি আমাদের সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা বলে কিছু থাকবে না? মাসুদা ভাট্টির ভাষায়, তসলিমা যদি আমাদের কামশাস্ত্রই শিখিয়ে থাকেন তাহলে তো বড় একটা উপকার করেছেন তিনি। কারণ যৌনতা নিয়ে আমাদের অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা, ভণ্ডামি এবং অজ্ঞতা দেখে আমার তো মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে আগে যে বিষয়টি অবশ্য পাঠ্য করা উচিত তা হলো হিউম্যান সেক্সুয়ালিটি।

তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, তিনি কারো প্ররোচণায় বা কারো টাকা নিয়ে এ রকম কাজটি করেছেন। এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কারণ আমি জানি না, আদৌ এ রকম কোনো বিষয় আছে কি না। অবশ্য এখন বাংলাদেশের টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সাহিত্য পাড়া সর্বত্র হয় মামা-খালুর খুটির জোর, না হয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দৌরাত্ম। এটাই রেওয়াজ এখন। সেখানে মেধার সহজাত প্রাপ্তিকেও অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেন আজকাল। এ কথাগুলো তসলিমার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য বলছি না কিংবা বলছি না যে, হোমরা-চোমরা বা রাজনৈতিক নেতার আত্মীয় প্রতিভাবান লেখক অথবা শিল্পী হতে পারবে না। তবে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে অনেকেরই অর্জন ঘটছে অথবা ঘটে। তাই এটাকেই মানুষ আজকাল স্বাভাবিক রীতি হিসেবে ধরে নিচ্ছে।

আমাকে সেই জার্মানি থেকে ফোন করে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তসলিমা তো হার্ভার্ডের কেনেডি স্কুল অফ গভর্নমেন্টে ফেলো হিসেবে এক বছরের জন্য গিয়েছেন। ওখানে (স্কুল অফ গভর্নমেন্টে) তো সরকারি তদবির ছাড়া কিছু হয় না।

তার উৎসাহের আগুনে পানি ঢেলে বললাম যে, আমার এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। দয়া করে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন বলে অভদ্রের মতো ফোন রেখে দিলাম।

তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে চাই। তসলিমা নাসরিন তার লেখায় মালেকা বেগম থেকে শুরু করে বাংলাদেশের দুই প্রধান নেত্রী সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। আমি জানি যে, বাংলাদেশের নারী নেতৃত্ব নিয়ে অনেকেই পারিবারিক রাজনীতি, সাধারণ মানুষের শিক্ষার অভাব ইত্যাদি বলবেন। তা যাই বলুন না কেন, এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উদ্ভাসিত। তা হলো, বাংলাদেশের মানুষ নারী নেতৃত্বকে অনেক আগেই মেনে নিয়েছে। পাশ্চাত্যে বুদ্ধিজীবীদের (সবাই এক দলভুক্ত নয়) একটি প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। সেটা হলো, যেভাবেই হোক, এরা ছলে-বলে-কৌশলে সব কিছুর কৃতিত্ব নিজেদের ভাগে নিতে চান। আর যখন কৃতিত্বটা নিতে পারেন না তখন অন্যেরটাকে অবমূল্যায়ন করেন। যেমন গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ দাবিদার খোদ আমেরিকাতে একজন নারীও দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যেতে তো পারেনিই, এমনকি মাত্র সত্তর আশি বছর আগে মেয়েদের ভোটাধিকারও ছিল না এখানে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আমার এক শিক্ষক যিনি একজন খ্যাতিমান দার্শনিকও, তার পলিটিকাল ইকনমি ক্লাসে সব সময় কেস স্টাডি দিতেন বাংলাদেশ বা ইনডিয়া অথবা অন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশের নেতিবাচক ঘটনা থেকে। যেমন ইনডিয়াতে গর্ভবতী মায়ের শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ এবং শিশুটি মেয়ে হলে গর্ভপাত ঘটানো বা আফৃকার মেয়েদের লিঙ্গচ্ছেদ করানো (Female Circumcision) ইত্যাদি।

একদিন পুরো ক্লাসের মধ্যে দাড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা শুধু একতরফাভাবে আমাদের গলদের কথা বললে হবে না, এর পাশাপাশি তোমাদেরটাও বলতে হবে। যেমন এখানে সত্তর বছর আগে মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্র ক্ষমতায় এখনো কোনো নারী আসতে পারেনি। এখানে টেলিভিশন খুললেই *সাইকিক রিডিং*-এর মতো অবৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিজ্ঞাপন, আইনজীবীরা সারাক্ষণ টেলিভিশনে অন্যকে মামলা করার জন্য প্ররোচিত করছে ইত্যাদি। তিনি অবশ্য পুরো ক্লাসের সামনে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, এখন থেকে এগুলোও বলা হবে। আমার আশংকা, তসলিমা নাসরিন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা নিজেদের সুপৃমেসি ঠিক রাখতে প্রাচ্য কিংবা অন্য সভ্যতাকে ছোট করার চেষ্টা করেন তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত না হন।

ক নিয়ে এই সাম্প্রতিক বিতর্কে খুশিতে বগল বাজাচ্ছে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি। কারণ, এখানে প্রগতিবাদীরা পরস্পরকে ডোবানোর কাজে মেতেছেন। অনেকটা সত্তর আশি দশকের বামপন্থী দলগুলোকে ঠেকানোর জন্য আমেরিকান থিওরি Red Flag Will Destroy Red Flag বা লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ঠেকাও-এর মতো।

আমি বলবো, এতোটা পুলকিত হবেন না। মধ্যযুগের মতো কূপমণ্ডুকতাকে, অন্ধত্বকে আকড়ে ধরে থাকার চেয়ে এ রকম দ্বন্দ্বেরও প্রয়োজন আছে। যৌনতা জীবন বিবর্জিত কিছু নয়। এই দ্বন্দ্বে কখনো কখনো কাদা ছোড়াছুড়ি হয় বটে কিন্তু তা থেকেই বেরিয়ে আসে বাকস্বাধীনতা, নারী অধিকার, মানব অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো। আর আমাদের বুদ্ধিজীবী, লেখকেরা সুমতির পরিচয় দিয়ে এ বিতর্ককে সেদিকেই নিয়ে যাবেন আশা করি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না গ্লাসের অর্ধেক ভর্তি, অর্ধেক খালি দুটোই সত্যি। সব কিছু নির্ভর করে কে কোনভাবে দেখছি তার ওপর। আমি চিরকালই অর্ধেক ভর্তির পক্ষে।

sezan_mahmud@sbcglobal.net
saleh_rahman_97@post.harvard.edu
ওহাইও থেকে

২৭ নভেম্বর ২০০৩